Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 253 –258
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

প্রকৃতি চেতনায় মহাকবি কালিদাস : একটি সমীক্ষা

Kalidasa in Nature Consciousness : A Survey

সৌরভ পাল
sact, সংস্কৃত বিভাগ
বিবেকানন্দ কলেজ, আলিপুরদুয়ার
ইমেইল : yourssouravpaul@gmail.com

Keyword
Kalidasa, Drama, Sakuntala, Kanva, Cloud, Dushyanta, Alaka, Himalaya.

Abstract
Why Kalidasa is called poet of nature can be understood by reading any of his poems or dramas. Mahakavi Kalidas has used the nature effectively in his poetry and plays. He is the true shaper of both inner and outer nature of man. He used the nature sometimes as a mood, sometimes as a stimuli and sometime only as an illustration. 'Rtusamhara', 'Raghuvamsa', 'Kumarasambhava', 'Meghaduta', 'Abhijnanashakuntala' - everywhere there is an identity of his love of nature, the extreme closeness of human life to nature. In "Rtusamhara, he has shown the variation that comes in human life with the variation of season. In 'Raghuvamsa', the poet shows his love for nature in the description of natural scenes like frothy ocean, green forest etc, and also the love of hero and heroin in the braking of the sea waves. In describing of the wonderful beauty of Himalayas in the first canto of the epic 'Kumarasambhava', In "Meghaduta" yaksha's unconscious use of cloud as a messenger, in the description of rivers and wonderful beauty of city Alaka – Kalidasa's love for nature is found. In the drama 'Abhijnanashakuntala' also the nature is depicted as one of the main character with other characters like Dushyanta. Sakuntala, Anasuya, Priyambada, Kanva etc. In the words of R.N Tagore, A fairy tale can be written by making nature as a human being and putting words in its mouth but to keep nature as nature and make it so live, so perceptible, so comprehensive, so intimate, to accomplish so much drama by it, which he never seen anywhere else. The nature assumes a central role in all of the Kaladasa's work. There for there is no fault in awarding Mahakavi Kalidasa as 'poet of nature'.

Discussion

কবি পরিচিতি :

মহাকবি কালিদাস তার অমর সৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যকে এক সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একাসনে বসার যোগ্যতা প্রধানতঃ কালিদাসের সাহিত্যকীর্তির দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু কবি

নিজের জন্মভুমি, আবিরভাবকাল, পারিবারিক জীবন প্রভৃতি সম্মন্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। তার এই নিরবতাই তাকে কিংবদন্তী করে তুলেছে।

" হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।"[১]

মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব-লগ্ন নিয়ে যে কি ভীষণ রকম মত পার্থক্য আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমান কবিগুরু রবিন্দ্রানাথের এই উক্তি। গবেষণা বিস্তর হলেও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয়নি। যাই হোক, বিভিন্ন মত বিশ্লেষণ করে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম হতে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী – এই সময়কালকেই কালিদাসের সময় হিসেবে ধরা হয়েছে।

কবি তার জন্মভুমি সম্পর্কে নিজে কিছু সেভাবে বলে যাননি। তার সমস্ত কাব্য- নাটক সংস্কৃত ভাষাতে রচিত হওয়ায় সংস্কৃত ভাষা সারা ভারতে প্রসারিত থাকায় ভাষাও এব্যাপারে কিছু প্রমান দিতে পারেনি সেভাবে। তবে সংস্কৃত ভাষার প্রধান রীতিগুলির মধ্যে বৈদর্ভী রীতির প্রতি তার বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে - "বৈদর্ভীরীতিসন্দর্ভে কালিদাস প্রগলভতে"। এই বৈদর্ভী রীতির যোগ রয়েছে দাক্ষিনাত্যের বিদর্ভ দেশের সাথে, এছাড়া বিদর্ভ দেশের আচার - বেশভূষার প্রতিও কবির টান রয়েছে। এইসব দিক বিচার করে তাকে দাক্ষিনাত্যের অধিবাসী বলেই মনে হয়।

বিশ্লেষণ :

এখানে মূল আলোচ্য বিষয় হল মহাকবি কালিদাসের প্রকৃতি প্রেম এবং তার রচিত কাব্য ও নাটকগুলিতে প্রকৃতির প্রভাব। প্রকৃতি ও জীবজগৎ একই বিশ্ববিবর্তনের দুটি বিচিত্র প্রকাশ। এই কারনেই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মনুষ্য সমাজ ওতপ্রোত ভাবে জরিত। বহু যুগ ধরে কাব্যকল্পনায় এই সম্বন্ধটি রয়েছে। ইংরেজী কবিদের মধ্যে যেমন প্রকৃতিকে চেতন জীবরূপে দেখানর জন্য Wordsworth 'poet of nature' বা প্রকৃতির কবি উপাধি পেয়েছেন, তেমনি ভারতেও কালিদাসকে "প্রকৃতির কবি" আখ্যা দেওয়া হয়।

কবি কালিদাস তার কাব্যে ও নাটকে প্রকৃতিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন।তিনি মানুষের আন্তর ও বহিঃ- উভয় প্রকৃতিরই রূপকার। কবি প্রকৃতিকে কোথাও আলম্বন বিভাব, কোথাও উদ্দীপন বিভাব,আবার কোথাও বা শুধুই চিত্রকল্প হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'ঋতুসংহার', 'রঘুবংনশ', 'কুমারসম্ভব', 'আভিজ্ঞান শকুন্তল' – সর্বত্রই তার প্রকৃতি প্রেমের, প্রকৃতির সাথে মানব জীবনের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার অনুভূতির পরিচয় মেলে।

ঋতুসংহারে প্রকৃতি :

কবির সর্বপ্রথম রচনা ঋতুসংহারে প্রকৃতি ও মানুষের হৃদয়ের আত্মিকটা প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যে বঙ্গ প্রকৃতির ছয় ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতি রাজ্যে পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে কেমন পরিবর্তন হয় তাই বর্ণিত হয়েছে। বিশেষতঃ প্রেমিক – প্রেমিকার হৃদয় বৃত্তিতে ঋতু পরিবর্তন যে ভাব - বৈচিত্র্য আনে তা খুব সুন্দএ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে কালিদাসের এই প্রথম প্রয়াসে। এক কথায় প্রকৃতি ও মানব জগৎ - এই দুই যেন মিলেমিশে গেছে এই কাব্যে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ এবং প্রাণীকুলের শোচনীয়ে অবস্থার চিত্র যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা এককথায় অবদন্য।এখানে প্রকৃতি আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব হিসেবে অঙ্কিত।

মেঘদূতে প্রকৃতি :

এই গীতি ক্যাব্যে প্রকৃতির সজীব চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা। কুবেরের অভিশাপে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষ আষাঢ় মাসের প্রথম দিন আকাশে নবোদিত মেঘকে দেখে তাকেই নিজের প্রিয়ার কাছে অলকা পুরীতে সংবাদ প্রেরনের জন্য দুত হিসেবে নিয়োগ করেছেন -

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রিরাপরিণতগজপ্রেক্ষনীয়ং দদর্শ।।"[২]

"গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা।।"[৩]

কবি এখানে অচেতন মেঘে চেতন সত্তা আরোপ করেছেন।

এই ক্যাব্যে নদনদী গিরি- নগরী এক একটি জীবন্ত চরিত্র রূপে বর্ণিত হয়েছে।মেঘের গমনপথে প্রকৃতি বিচিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছে। সেখানে বিন্ধপাদে বিশীর্ণা, রেবানদী,চঞ্চলা বেত্রবতী ক্ষীণ সলিলা সিন্ধু প্রভৃতি নদীগুলি যেন বিভিন্ন প্রকারের নায়িকা।কবির ভাষায়—

"রেবাং দ্রক্ষ্যসুপলবিষয়ে বিন্ধপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য।।"[৪]
" তিরোপান্তস্তনিতসুভগাং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি।।"[৫]
"বেণী ভূতপ্রতনুসলিলাঽসাবতীতস্য সিন্ধু।"[৬]

এই ভাবে মহাকবি কালিদাস প্রকৃতিকে যেন জীবন্তরূপ দিয়েছেন এই গীতিকাব্যে।

কুমারসম্ভবে প্রকৃতি :

এই মহাকাব্যে মহাকবির প্রকৃতি সচেনতার প্রমাণ পাওয়া যায় হিমালায়কে একটি অন্যতম চরিত্র রূপে অঙ্কিত হওয়ায়। কবি প্রথম সর্গের শ্লোকে শ্লোকে হিমালয়ের মহিমা বর্ণনা করেছেন। কবির ভাষায় - হিমালয় হল পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ –

"পূর্বাপরৌ তৌয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদন্ড।"[৭]

হিমালয় হল চন্দ্রের ন্যায়, যাতে সমস্ত কলঙ্ক বিলীন হয়ে যায় –

"অনন্তররত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপী হাতম্।
একো হি দোষো গুনসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্ক।।"[৮]

হিমালয় দিবালোকভীত গুহালীন অন্ধকারকে রবিকিরণ হতে রক্ষা করে যেমন নীচ ব্যক্তি উন্নত জনের শরণাপন্ন হলে তাহার প্রতি মমতাই জন্মায়। এই ভাবে কবি হিমালয়কে অন্যতম প্রধান চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন।

রঘুবংশে প্রকৃতি :

মহাকবি এই মহাকাব্যের প্রথম সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে রঘুবংশকে দুস্তর মহাসাগরের সাথে একই আসনে বসিয়ে প্রকৃতির প্রতি তার গভীর অনুরাগের নিদর্শন দিয়েছেন-

"ক্ব সূর্য প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয় মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তর্ মোহাদুড়ু পেনাস্মি সাগরম্।।"[৯]

মহারাজ দিলিপের মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে যাত্রাকালে প্রকৃতি ও মানুষের যে আত্মিক সম্পর্ক মহাকবি চিত্রিত করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথম সর্গের কিছু শ্লোকে —

"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যান্দনমাস্থিতৌ।

প্রাবৃষ্যেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব।।"[১০]

এখানে রাজা দিলীপ ঐরাবত এবং মহারানী যেন বিদ্যুৎ।

"কাপ্যভিখ্যা তয়োবাসীদ্ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেষয়া।
হিমনিমুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব।।"[১১]

এখানে রাজমহিষী চিত্রানক্ষত্র এবং মহারাজা দিলীপ চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হয়েছেন।

এছাড়া শালবৃক্ষের নির্যাসের গন্ধবাহী এবং পুস্পপরাগ বিক্ষেপকারী বায়ুর দ্বারা রাজদম্পতীর সেবা, আকাশে সারস পাখিদের শ্রেণীবদ্ধভাবে স্তম্ভহীন তোরণ মালা রচনা ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যেও মহাকবি প্রকৃতির সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের বন্ধনকে প্রদর্শিত করেছেন।[১২]

বিক্রমবর্ষীয়ে প্রকৃতি :

এই নাটকে উর্বশী লতায় পরিণত হয়েছেন এবং তার অন্বেষণে পুরুরবা উন্মত্ত হয়ে গেছেন। সমস্ত প্রকৃতি যেন তার চেতনার আকারে আকারিত।

অভিজ্ঞান শকুন্তলে প্রকৃতি :

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে প্রকৃতির চরিত্র চিত্রন সমগ্রতা লাভ করেছে। আলোচ্য নাটকের প্রস্তাবনা অংশে রয়েছে গ্রীষ্মকালে পাটল সংসর্গে সুরভিত বনবায়ুর কথা, ভ্রমরের দ্বারা ঈষদীষদ্ চুম্বিত সুকুমার শিরীষকুসুমের বিলাসিনী নারীর কর্ণভূষণ হওয়ার বর্ণনা—

"ঈষদীষচুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ সুকুমার কেশর শিখরাণি।
অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরীষকুসুমানি।।"[১৩]

নাটকের প্রথমাঙ্কে মালিনী তীরবর্তী মহর্ষি কন্বের আশ্রম। তপবনের প্রান্তভাগে শুকপাখিদের আস্রয়স্থল গাছের কোটর থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিবাধান নিচে পড়ে আছে। হরিনেরা এখানে নির্ভয়ে বিচরন করে, তরুলতাগুলি সাদর স্নেহে লালিত। শকুন্তলা, অনসুয়া, প্রিয়ংবদা ও বন জ্যোৎস্নাকে আলাদা করা যায় না। নবজাত পত্রের সাথে শকুন্তলার দেহলাবন্যের তুলনা, ভ্রমরের দ্বারা শকুন্তলার রতি সম্ভোগের কল্পনা প্রভৃতি দৃশ্য প্রকৃতিকে সজীব করে তুলেছে।[১৪]

দ্বিতীয় অঙ্কে রয়েছে প্রকৃতির নৈব্যক্তিক ছবি। গ্রীষ্মকালে মহিষের জলে আবগাহন, মৃগকুলের রোমন্থন, জলাসয়ে শূকরদের মুস্তাঘাস উৎপাটন বর্ণনাতেও অরণ্যকুলের জীবন্ত ছবি ধরা পড়ে।[১৫]

তৃতীয় অঙ্কে প্রকৃতি উদ্দীপন বিভাব হিসেবে কাজ করেছে। মালিনী তিরে নিভৃত লতাকুঞ্জ পদ্ম গন্ধে সুরভিত বনবায়ু বিরহ সন্তপ্ত নরনারীর হৃদয়ের আবেগকে জাগিয়ে দেয়।[১৬]

চতুর্থ অঙ্কে মানুষ ও প্রকৃতির আত্মিক বন্ধন সকল্কেই মুগ্ধ করে। তপবন ভুমিতে আজন্ম লালিত শকুন্তলা পতি গৃহে যাবে। বনদেবতারা শকুন্তলাকে অলঙ্করণের জন্য ক্ষৌম যুগল, নানারকম অলঙ্কার ও লাক্ষা রস উপহার দিচ্ছে - যেন রাজরানীর মত নিজের কন্যাকে যোগ্য ভূষণে আভুষিত করে পাঠাতে চাইছে।[১৭] বনপ্রকৃতির সাথে শকুন্তলার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। আশ্রমের গাছগুলিতে জল না দিয়ে সে জল্পান করত না, স্নেহ বসত একটি পাতাও ছিড়ত না। গাছগুলির প্রথম ফুল ফতার সময় শকুন্তলার আনন্দের সীমা থাকত না, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে তাই মহর্ষি কণ্ব সকল আশ্রম তরুর কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন-

"অনুমতি গমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ং বনবাস বন্ধুভিঃ।"[১৮]

কোকিল রবের দ্বারা গাছগুলি যেন গমনের অনুমতি দিল। শকুন্তলাকে যেতে দেখে হরিণীদের মুখ থেকে ঘাসের গ্রাস পড়ে যাওয়া, ময়ুরগুলির নাচে অনীহা, লতাগুলো হতে হলদেপাতা খসে পড়া—এগুল তপবনের জীবন্ত প্রকৃতির বিরহের চিহ্ন বহন করছে।[১৯]

যে হরিণ শিশুটিকে শকুন্তলা মাতৃ স্নেহে বড় করেছে সে শকুন্তলার শাড়ির আঁচল তেনে ধরেছে। এই অবস্থায় শকুন্তলার ছখ জলে ভরে গেছে।[২০] শকুন্তলা যেমন তপোবনের বিরহে কাতর ঠিক তেমনি শকুন্তলার বিরহেও তপবনের একই রকম অবস্থা হয়েছে। তাই শকুন্তলা ছলে যাওয়ার পর অনুসুয়া ও প্রিয়ংবদা বলেন—

"শকুন্তলা বিরহিতং শূন্যমিব তপোবনং প্রত্বিশাগ।"[২১]

বনের সাথে মানুষের বিচ্ছেদ যে আত করুন হতে পারে তা কেবল এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কে প্রকাশ পেয়েছে।

পঞ্চম অঙ্কে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে না পেরে তাকে পাণ্ডু বর্ণের পত্রের মধ্যে থাকে কিসালয়ের সাথে তুলনা করেছেন।[২২]

ষষ্ঠ অঙ্কে প্রকৃতি যেন অনুশোচনা গ্রস্থ দুষ্যন্তের হৃদয়ের ছবি। বসন্ত এসেছে কিন্তু আমের মুকুলে পরাগ আসেনি। কুরবক কুড়ি হয়েই আছে, কোকিলের কণ্ঠ স্খলিত হয়েছে।[২৩]

সপ্তম অঙ্কে রয়েছে দুষ্যন্তের আকাশপথে স্বর্গে গমনকালে প্রবাহ বায়ুর স্তর, মেঘমালা, হেমকুত পর্বত প্রভৃতির বর্ণনা।[২৪]

এই ভাবে এই নাটকের প্রতিটি অঙ্কে মহাকবি কালিদাস তার প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শকুন্তলা নাটকে প্রকৃতি যেন মেরুদণ্ড। দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমকে এই রমণীয় প্রকৃতি যেন ভরাট করেছে। এই প্রকৃতি হতে বিছিন্ন করলে শকুন্তলার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দুষ্যন্ত, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, কণ্ব, গৌতমী সমস্ত মিলে এক নির্জীব মানবস্তূপ পড়ে থাকে মাত্র এবং কালিদাসের কালিদাসের প্রেম সহসা অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, কালিদাসের সমগ্র সৃষ্টিতেই প্রকৃতি বিশাল ভুমিকা পালন করেছে। প্রকৃতির সাথে মানুষের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিশ্ব সাহিত্যে কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতি কালিদাসের কাব্যে একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার 'প্রাচীন সাহিত্যে'র শকুন্তলা প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন-

> "অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে অনসূয়া - প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন যেমন, প্রকৃতিও তেমন এক বিশেষ পাত্র। ...প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রুপক নাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজিব,এমন প্রতক্ষ্য, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই।"[২৫]

তথ্যসুত্র :

১. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পাদক), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' সংস্কৃত পুস্তাক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪১ (ভুমিকা অংশ)
২. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পাদক), 'মেঘদুত ও সৌদামিনী', সংস্কৃত পুস্তাক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৯৬
৩. তদেব পৃ. ১১২
৪. তদেব পৃ. ১৪৮
৫. তদেব পৃ. ১৫৯
৬. তদেব পৃ. ১৭২
৭. ভট্টাচার্যেণ, শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পাদক), 'কুমারসম্ভবম্', সংস্কৃত পুস্তাক ভাণ্ডার, কলকাতা,

২০১২, পৃ. ১ - ৩
৮. তদেব পৃ. ১০
৯. দাস, দেবকুমার (সম্পাদক), 'রঘুবংশম্', 'সদেশ', কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ৩৬
১০. তদেব পৃ. ৪৭
১১. তদেব পৃ. ৭৬
১২. তদেব পৃ. ৭৯
১৩. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পাদক), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' সংস্কৃত পুস্তাক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৬
১৪. তদেব পৃ. ৪৯
১৫. তদেব পৃ. ৬৫
১৬. তদেব পৃ. ৬৯
১৭. তদেব পৃ. ৭২
১৮. তদেব পৃ. ১৩৪
১৯. তদেব পৃ. ১৭৮
২০. তদেব পৃ. ২৬২
২১. তদেব পৃ. ২৭২
২২. তদেব পৃ. ২৭২, ২৮২
২৩. তদেব পৃ. ৩৩৫, ৩৯২
২৪. তদেব পৃ. ৪৮২,
২৫. তদেব পৃ. ১৩৯ (ভুমিকা অংশ)